ঘর দুয়ার

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

খেলোয়াড়ের টুপি

হাটের গণ্ডগোল থেকে মানুষ যেমন তার
ঘরের পথে পা বাড়ায়,
কথাগুলিও এমন তেমনি পা বাড়িয়েছে
শব্দ থেকে
শব্দহীনতার দিকে।

চতুর্দিকে এখন ফিরে যাবার, ফিরিয়ে নেবার পালা।

ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত অনুতপ্ত সন্তানের মতো
গন্ধ দিরে যাচ্ছে ফুলের মধ্যে,
আর
এতক্ষণ যা আলোয় ঝলমল করছিল, সেই
মন্দিরচূড়া থেকে তাঁর

শেষ হিরণ্ময় বল্লমকে ফের
ফিরিয়ে নিচ্ছে সূর্যদেব।

অন্ধকার থেকে দৃশ্যগুলি একে-একে
আলোর বৃত্তে নেমে এসেছিল।
যে যেমন দেখতে চায়,
দিনভর
সে তেমন দেখেছে।
কিন্তু আর নয়,
হাওয়ায় উড়িয়ে দেওয়া যাবতীয় টুপি যেভাবে
খেলোয়াড়ের মাথায় ফিরে আসে,
ঠিক তেমনিভাবে সব দৃশ্য এখন আবার
মিছিল বেঁধে
অন্ধকারের মধ্যে ফিরবে।

মাস্তুল থেকে নেমে আসছে বাদাম,
দুর্গশীর্ষের লৌহদণ্ড থেকে ঝুলে পড়ছে পতাকা,
স্তনসন্ধির অন্ধকারে মুখ ঢাকবার জন্যে
রণক্ষেত্র থেকে
সৈনিকও এখন ফিরে যাচ্ছে তার
নিজস্ব নারীর কাছে।

চতুর্দিকেই এখন ফিরে যাবার, ফিরিয়ে নেবার
শব্দহীন আয়োজন।
মেলার মাঠে ছড়িয়ে রাখা তার
খেলাগুলিকে আবার

বাক্সে তুলে রাখছে দোকানি।
রাত হয়েছে,
তারও এখন ঘরে ফেরার পালা।

গুরু যা বলেন

মস্ত বড় মিরগেলটাকে বঁড়শিতে গাঁথবার জন্যে
ফাতনার উপরে চোখ রেখে
শ্রীমন্ত সেই সকাল থেকে
ঘাটের রানায় বসে আছে।
আসলে ওই মাছটাই যে তাকে টোপ গিলিয়ে গেঁথে রেখেছে,
শ্রীমন্ত তা জানে না।

সকাল ছ'টা অব্দি খুনের আসামি রামদেও কাহারকে
পাহারা দেবার জন্যে
রাত-দশটায় যে-লোকটা
থানা-হাজতের দায়িত্ব বুঝে নিয়েছিল,
পাথুরে করিডরে যতই না কেন বুট বাজাক,
সেই মহেশ্বরপ্রসাদও জানে না যে,
পুরোপুরি আট ঘন্টার জন্যে সে নিজেই এখন বন্দি।

টেকো-কালোয়ার ঘনশ্যামের দ্বিতীয় পক্ষের বউ ইদানিং আর
কারণে-অকারণে
জানলায় গিয়ে দাঁড়ায় না। কিন্তু
ঘনশ্যামের লোহার কারবারও ওদিকে প্রায়
বেহাত হবার উপক্রম।
অষ্টপ্রহর ঘরে মধ্যে ঘুরঘুর করছে যে ঘনশ্যাম,

সে জানে না যে, তার
জোয়ান বউকে জানলা থেকে হটাতে গিয়ে
সে নিজেই এখন তার কারবার থেকে হটে গিয়েছে।

লোডশেডিং, লিফ্‌ট বন্ধ, তবু
চটপট তাঁর চাকরি-জীবনের সাততলায়
উঠতে চেয়েছিলেন
জায়ান্ট ট্রান্সপোর্টের ছোট-সাহেব শ্রীহেরম্বনাথ বিশ্বাস।
হায়, তিনিও জানতেন না যে,
এক-এক লাফে সিঁড়ির তিন-ধাপ টপকাতে গিয়ে তাঁর
মাথাটা হঠাৎ ঝন্‌ করে ঘুরে উঠবে, এবং
তৎক্ষণাৎ গন্তব্য স্থানের ঠিকানা পাল্‌টে তিনি
সাততলার বদলে
পার্ক স্ট্রিটের এক নার্সিং হোমে পৌঁছে যাবেন।
সিঁড়ি ভাঙা বন্ধ। ডাক্তারবাবু জানিয়ে দিয়েছেন যে, বাড়িতেও তাঁর
শোবার খাটটাকে এবারে
দোতলা থেকে একতলায় নামিয়ে আনলে ভাল হয়।

আমাদের পাড়ার গোষ্ঠবাবু সেদিন বলেছিলেন যে,
তাঁর গুরু যা বলেন, ঠিকই বলেন।
গুরু কী বলেন, সান্ধ্য আড্ডার সঙ্গীরা তা জানবার জন্যে
হামলে পড়ায়
খুব একচোট হেসে নিয়ে, তারপর
হঠাৎ ভীষণ গম্ভীর হয়ে গিয়ে
গোষ্ঠবাবু বললেন, “কাউকে আবার বোলো না যেন,
এমনিতে তো এ-সব কথা কাউকে বলতে নেই,
নেহাত তোমরা জানতে চাও তাই বলছি।

আমার গুরু বলেন যে,
শুয়োরের বাচ্চারা কেউ কিস্‌সু জানে না।”

চিত্রমালা

গাঢ় নীল মেঘের
এলো খোঁপাটাকে খুলে ফেলতেই
নীচের মাটিতে
লাফিয়ে নামল
নদী।

লোহার-হৃদপিণ্ড-নিংড়ানো তার রক্তবর্ণ জলের মধ্যে
পোচড়া ডুবিয়ে
জঙ্গলের গায়ে ছিটিয়ে দিতেই
ফুটে উঠল
টকটকে লাল
মোরগ-ফুল।
জঙ্গলের মধ্যে ছিল
ধূমল-বর্ণ হাতির পাল।
ক্যানেস্তারা পেটাতে-পেটাতে
দিগন্তের দিকে তাদের
তাড়িয়ে দেওয়া হল।
আর সঙ্গে-সঙ্গেই আকাশের গায়ে
জেগে উঠল
পাহাড়।

ছবিটা আমার সাধ্যমত সাজিয়ে দিয়েছি।
তোমরা যারা ছুটিতে এবার
সিংভূমে বেড়াতে যাবে,
দ'চোখ ভরে দেখে নিয়ো।

চিরমায়া

বাহিরে দেখি না, শুধু স্থির জানি ভিতরে কোথাও
চৌকাঠে পা রেখে তুমি দাঁড়িয়ে রয়েছ,
চিরমায়া।
দাঁতে-চাপা অধরে কৌতুক স্থির বিদ্যুতের মতো
লগ্ন হয়ে আছে, ভুরু
বিদ্রুপের ভঙ্গিতে বাঁকানো, জ্বলে
কোমল আগুন
সিঁথি ও ললাটে। স্থির সরসীর মতো দুই চোখে
চক্ষু রেখে জগৎ-সংসার
অকস্মাৎ তার
কার্যকারণের-সূত্রে গাঁথা মাল্যখানিকে ঘোরাতে
ভুলে যায়।

বাহিরে দেখি না, কিন্তু ভিতরে এখনও
ওই মূর্তি জাগিয়ে রেখেছ,
চিরমায়া!
বুঝি না কী মন্ত্রে তুমি জয়ে-বিপর্যয়ে
লগ্ন আজও রয়েছ হৃদয়ে।
কী রয়েছে ওই চোখে, অধরে অথবা
ওই যুগ্ম ভুরুতে তোমার?

প্রত্যাশা, না পরিহাস? নাকি যুদ্ধশেষে ফের যুদ্ধঘোষণার
অভিপ্রায়?
কিছুই বুঝি না, চিরমায়া,
এক অর্থ উদ্ধার না-হতে যেন সহসা আর-এক অর্থ
খুলে যায়।

বেঁধেছ অলক্ষ্য ডোরে। যে-রকম উড্ডীন পাখীও
বস্তুত অরণ্যে বাঁধা, কিংবা দিগ্বিজয়ীও যেমন
অদৃশ্য সুতোয়
টান পড়বামাত্র তার একমাত্র-নারীর
জঙ্ঘা অবলোকনের জন্য বড় ব্যস্ত হয়ে ওঠে,
চিরমায়া,
আমিও তেমন ফিরি, নতজানু হয়ে
নিরীক্ষণ করি ওই জঙ্ঘা ও জঘন, স্তনসন্ধির গোপনে
রাখি মুখ। আমিও তেমন
বুঝে নিতে চেষ্টা করি দাঁতে-চাপা ওষ্ঠের ইঙ্গিত।
এবং দেখি যে, স্থির সরসীর মতো দুই চোখে
পলকে পলকে
স্বর্গ-মর্ত-পাতালের ছায়া
দুলে যায়।

জয় কালী

পঁয়তাল্লিশ বছর বাদে দেখা, তবু কারও
ভুলভাল হল না।
এসপ্ল্যানেডে বর্ষার সন্ধ্যায়

এক-নজরে দুজনেই দুজনকে চিনলুম। পক্ককেশ
পৌঢ় পরক্ষণে
বালকের মতো হাসল, প্রশ্ন করল, “কী রে,
আজকাল কোত্থেকে ঘুড়ি কিনিস? আবদুল
মৌলালির মোড়ে
এখনও লাটাই ঘুড়ি টানা-মাঞ্জা বিক্রি করে নাকি?”

শুনে আমি হতভম্ব হয়ে চেয়ে থাকি
ইস্কুলের বন্ধু কালীপদ
মল্লিকের দিকে। আমি তিন বছর বাদে
চাকরি থেকে অবসর নেব, কিন্তু দু-দুটো মেয়ের
একটাও পাত্রস্থ হয়নি, বাড়ির বাবদে
ঘাড়ে দেনা, পেটে অম্লশূল,
সাংসারিক দায়-দায়িত্ব বাড়ছে শুধু, কমছে না একটাও,
উপরন্তু গিন্নির হাঁপানি।...আমি আর
একাদশবর্ষীয় বালক নই, তবু কেন হতচ্ছাড়া কেলো
ঘুড়ি ওরাবার কথা বলে?

ডাইনে বাঁয়ে নেভে আর জ্বলে
বিজ্ঞাপনী বর্ণমালা। সম্ভবত সাঁওতালডিহির
প্রথম, দ্বিতীয় কিংবা প্ল্যান্টের
উৎপাদনে আজকে কোনো বিভ্রাট ঘটেনি।
আকাশে পুজোর গন্ধ, গঙ্গ থেকে ছুটে আসে হাওয়া
এইরকম সন্ধ্যালগ্নে ভিক্ষারিও স্বপ্ন দেখে, আর
যেন জাদুদণ্ডের ছোঁয়ায়
পালটে যায় কলকাতার মুখচ্ছবি।
চৌরঙ্গির মোড়া মেট্রো-রেলের দেওয়ালে
প্যান্টের বোতাম খুলে যারা ভারমুক্ত হচ্ছে, তাদেরও এখন

বালকের মতো
সুখী ও নিশ্চিন্ত বলে মনে হয়।

তাই বলে সময়
বসে থাকে নাকি? কালী, হয় তুই উন্মাদ কিংবা গাধা।
এই কথাটা বলতে গিয়ে পরক্ষণে ভাবি,
পাগল কি নির্বোধ নয়, যেখানে একদিন
ছেড়েছিল, কালী হয়তো হার-না-মানা গোঁয়ারের মতো
মধ্যবর্তী বছরগুলিকে
অস্বীকার করতে চাইছে, আর
একদম সেইখান থেকে ধরতে চাইছে পুরনো বন্ধুকে।

ধরা যায় না, কে না জানে, ইঁদারায় ঝুঁকে
কোনো-কিছু ধরতে গেলে খালি
বেদনাই বাড়ে।
তবুও অস্ফুট কণ্ঠে বলি তাকে, "জয় কালী, জয় কালী!"

ঠাকুমা বলতেন

ঠাকুমা বলতেন, "দাদা, খুব বেশি তো আর
বাঁচব না, এখন তাই সাধ্যমতো আল্‌গা দিয়ে থাকি।
যে অল্প সময় আছে বাকি,
দেখতে-দেখতে কেটে যাবে, তোমরা থাকো ভাল।
আমি দেখি কী করে আমার
আঁচলের গিঁটগুলোকে ধীরেসুস্থে খুলে ফেলা যায়।"

(যখনই বলতেন, বড় নম্র একটা আলো
ভেসে উঠত শান্ত দুটি অনচ্ছ চক্ষুর জানালায়।)

দিদি তো তক্ষুনি রেগে টং
বলত, "তুমি যাবে কোথা? দিচ্ছে বা কে যেতে?
আমরা চাইছি গল্প শুনতে, আমরা চাইছি খেতে।
নাড়ু, বড়ি, আম-কাসুন্দি খেয়ে দিব্যি আছি,
বুঝলে তো ঠাকুমা? তুমি বাজে কথা বাদ দিয়ে বরং
গল্প বলো, কিংবা সেই বিখ্যাত লাউয়ের-ঘন্ট রাঁধো
মুগডাল ছড়িয়ে, আমরা চাট্টি খেয়ে বাঁচি।
মোট কথা গিঁটগুলি তুমি শক্ত করে বাঁধো।"

ঠাকুমা বলতেন, "দিদি, যে-লোকটা সব-কিছু ছেড়ে একা
চলে গেছে, তার কথা যে বড্ড মনে পড়ে।
সে-ও তো বলত, কলকাতা-শহরে
চিত্তসুন্দরীর থেকে সুন্দরী যদি-বা থাকে, তার
অর্ধেক সুন্দর রান্না কোথাও পাবে না।...যার দেখা
স্বপ্নে রোজ পাচ্ছি, দিদি, তাকে ছেড়ে আর কি থাকা যায়?"
(বলতে-বলতে হাসি ফুটে উঠত ঠাকুমার
মুখে, আলো ভাসত দুটি অনচ্ছ চক্ষুর জানালায়।)